৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০৯

টপিক:

বাংলাদেশের নির্বাচন: নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি, সুষ্ঠু নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, নির্বাচনি আইন, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক দল, RPO.

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল: গণতন্ত্র ও রাজনীতি, ১৯৭২ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাজনৈতিক ধারা, রাজনীতি ও মতাদর্শ, রাজনৈতিক দলের গঠন প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক দল ও স্বাধীনতা অর্জন, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সম্পর্ক।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

নির্বাচন

❑ সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশের নির্বাচন

১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

- ✓ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার গঠনের পক্ষে বাংলাদেশে একটি প্রবল জনমত রয়েছে। পক্ষপাত মুক্ত হয়ে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন' নামে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকারের নির্বাহী বিভাগ নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে।
- ✓ সংবিধানের ১২২(১) অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সকল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ কিংবা পেশার ভিত্তিতে কোনো ধরনের বিভাজন করা হয়নি। সকলের সমান ভোটাধিকার নিশ্চিত করা রয়েছে।
- ✓ নির্বাচনে ভোটারগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে থাকে।
- ✓ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে থাকেন এবং প্রত্যেক ভোটারগণকে ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। এই পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে ভোটারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন।
- ✓ সংসদীয় নির্বাচনের জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ৩০০টি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকেন।
- ✓ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বর্তমানে নির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ក្ក: (ភោរ ស្មារតី: ការ?,

២ ស៊ោរ ផលិតផល ការង៉ា: [illegible]

៣ ពេល ភ្ញៀវ; ; ហេតុអ្វី?:

עבר — גבר

עבר
שלח

גרר
מטפחת

רגל
שמלה

רגל

① โลกา เพิ่มเติม: ราชา ๒,

ววท ส. อนุเคราะห์ อนุมัติ –

๒ อนุญาต อนุภูมิ ๒ [illegible]

๓ อนุบาล [illegible]

[illegible] [illegible] เพิ่มเติม, ๓ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

(๒) [illegible] [illegible] [illegible]

(๓) [illegible] ๑๒๘ ๒๐ [illegible]

(๔) [illegible] [illegible]

(๕) [illegible] [illegible] [illegible]

(๖) [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] / [illegible] ?

225 [illegible] [illegible] :-

196 [illegible] [illegible]

(ආ) President [illegible] [illegible] [illegible]

(ඇ) MP [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

(ඈ) [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

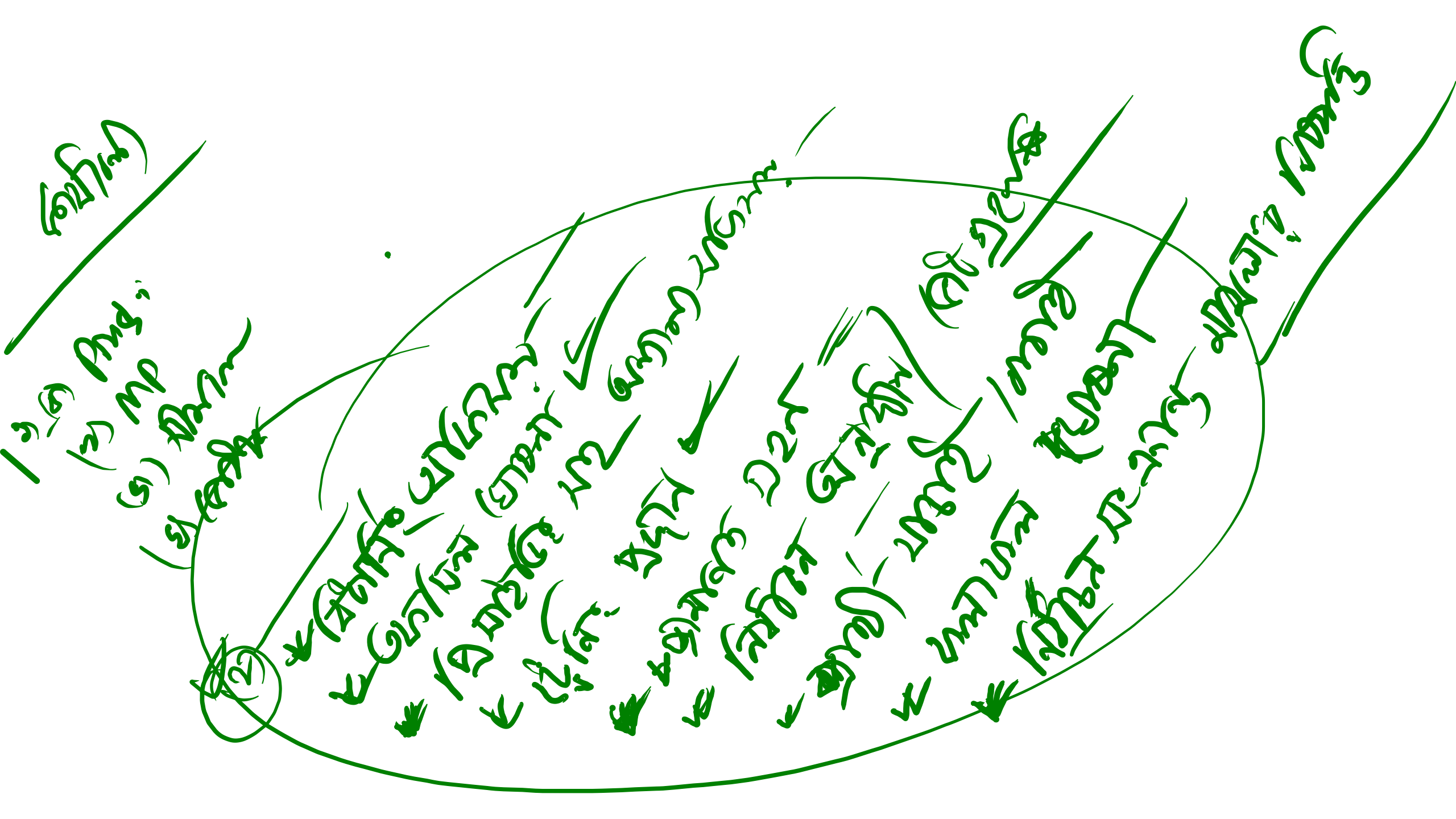

নির্বাচন

❑ বাংলাদেশে ভোটারদের যোগ্যতা

বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক এলাকার জন্য একটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক যেকোনো নাগরিককে ভোটাধিকার লাভের জন্য ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে ভোটার হবার যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

- ✓ বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
- ✓ ভোটার তালিকাভুক্ত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে;
- ✓ কোনো ব্যক্তি আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হলে চলবে না;
- ✓ নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ এলাকার অধিবাসী বলে বিবেচিত হতে হবে।

নোট: হওয়া. (মানসা) ?

১২২ অনুচ্ছেদ অনুসারে:

১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে

(২) ক খঃ

(খ)

(গ)

(ঘ)

১২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী -

১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে

(২) ক বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে

ক ১৮ বছর বয়স হতে হবে

ক আদালত কর্তৃক প্রকৃতিস্থ অপ্রকৃতিস্থ

ক নির্বাচনী এলাকা ভোটার

ক মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত নন

নির্বাচনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

❑ নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হলো নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বিদ্যমান। তাই সরকার গঠনে নির্দিষ্ট সময় পর পর জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও স্থানীয় উভয় ধরনের নির্বাচনই পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-

- **সাংবিধানিক:** বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে সাংবিধানিকভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সংবিধানের সপ্তম ভাগে ১১৮ থেকে ১২৬ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের গঠন, কার্যাবলি সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ করার জন্য শাসন বিভাগের সার্বক্ষণিক সহযোগিতার বিষয়টিও সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **স্বাধীন ও নিরপেক্ষ:** বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশন গঠন ও নিয়োগ দিয়ে থাকেন। নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্ব হলো নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন নিয়ে বিতর্কের আজও অবসান হয়নি। দু'একটি ব্যতীত প্রত্যেকটি কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর মতানৈক্য দেখা গেছে।
- **এককেন্দ্রিক:** বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন এককেন্দ্রিক। তবে দেশের প্রত্যেকটি উপজেলায় এর প্রশাসনিক কার্যালয় রয়েছে। স্থানীয় কার্যালয়গুলো কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সকল পর্যায়ের নির্বাচনেই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভূমিকা থাকে।

নির্বাচন কমিশনের গঠন ও দায়িত্ব

❑ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করবেন সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ লাভ করে থাকেন এবং তাদের কার্যকাল কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর। তবে কমিশনারগণ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতির নিকট স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। আবার অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের কারণে কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দায়িত্ব থেকে অপসারিত হতে পারেন, তবে তার জন্য সাংবিধানিক পন্থা রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের গঠন ও দায়িত্ব

❑ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

- ✓ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা প্রণয়ণের কাজ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; ভোটার তালিকা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তির দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।
- ✓ নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদের নির্বাচন ও উপ-নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে: নির্বাহী বিভাগ কেবল তাদেরকে চাহিদা মোতাবেক নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করে।
- ✓ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন সীমানা নির্ধারণ করে এবং এই সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তির দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।
- ✓ সংবিধান মোতাবেক সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।
- ✓ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় মনোয়নপত্র বাছাইয়ের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের এবং এ ক্ষেত্রে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে সে বিষয়ে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে।
- ✓ সংসদ সদস্যের অযোগ্যতা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তির দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

নির্বাচন কমিশনের গঠন ও দায়িত্ব

নিবন্ধন প্রাপ্তির শর্ত

২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ থেকে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রথা চালু হয়। সে বছরই প্রথমবার ছবিসহ ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়। 'রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮' অনুসারে রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পেতে একটি দলকে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্তগুলো হলো-

- ✓ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যেকোনো জাতীয় নির্বাচনের আগ্রহী দলটির যদি অন্তত একজন সংসদ সদস্য থাকেন; অথবা
- ✓ যেকোনো একটি নির্বাচনে দলটির প্রার্থী অংশ নেওয়া আসনগুলোয় মোট প্রদত্ত ভোটের ৫ শতাংশ পায়; অথবা
- ✓ দলটির যদি একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়, দেশের কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলায় কার্যকর কমিটি থাকে এবং অন্তত ১০০টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় কমপক্ষে ২০০ ভোটারের সমর্থন সংবলিত দলিল থাকে।

এছাড়াও 'রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইন, ২০২০' অনুসারে সকল পর্যায়ের কমিটির ন্যূনতম শতকরা ৩৩% সদস্যপদ মহিলার জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

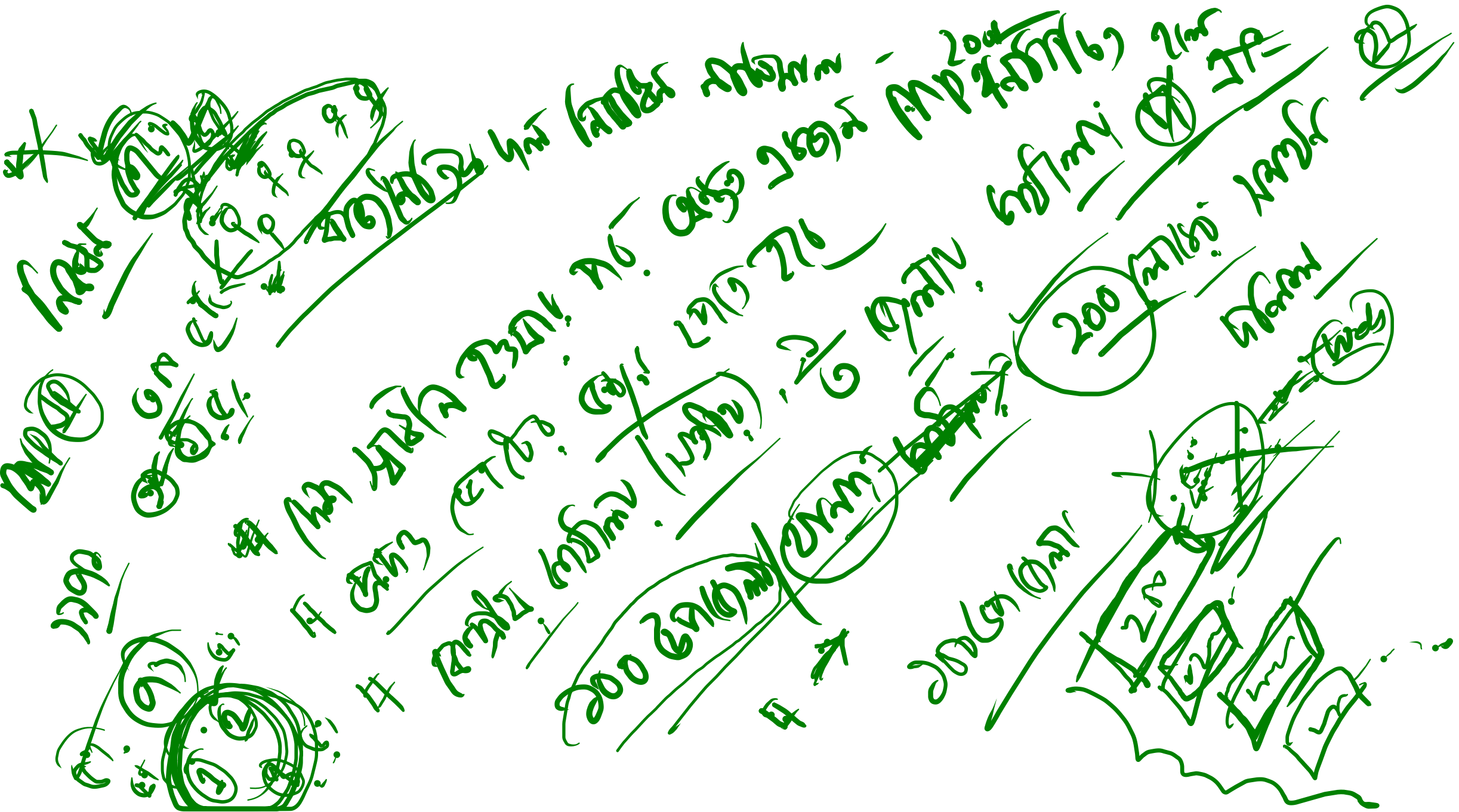

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন

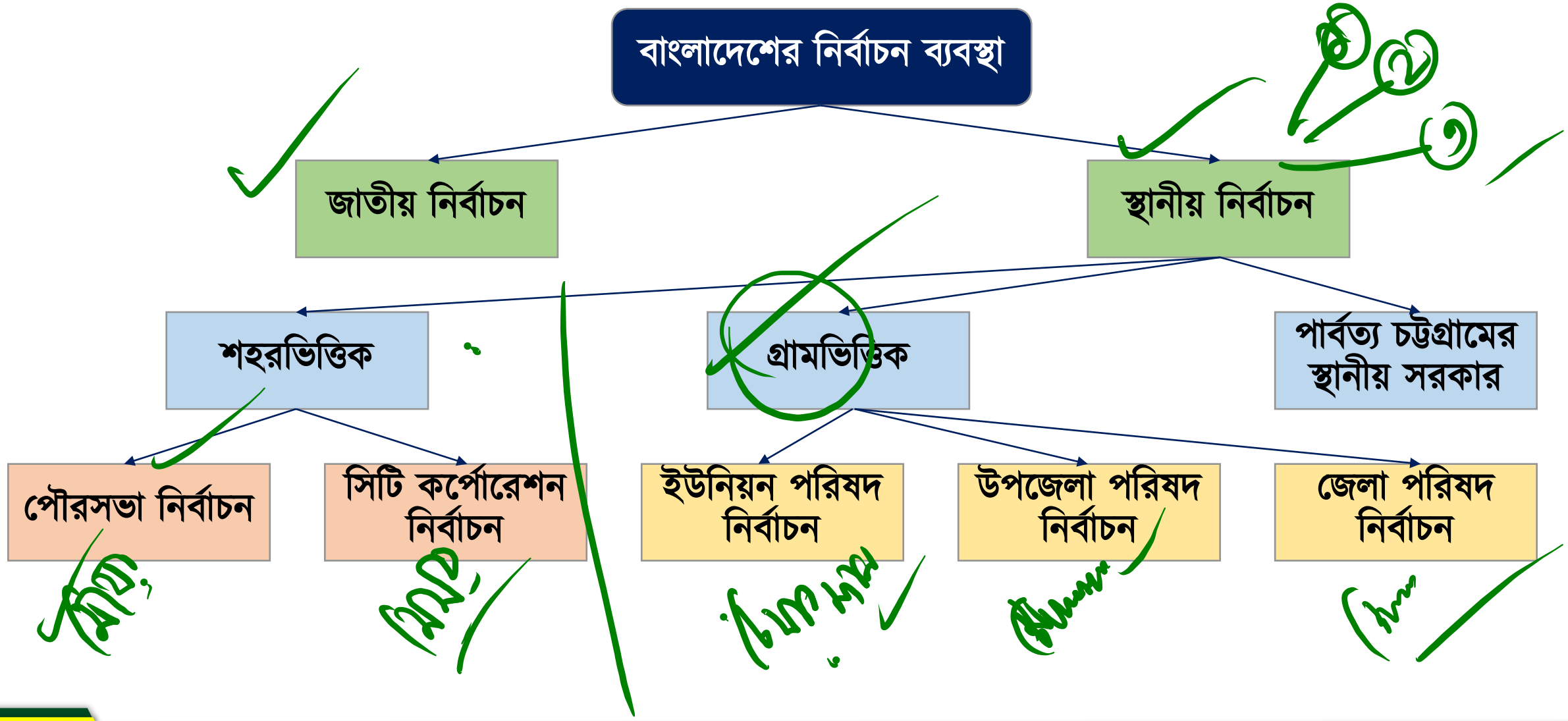

স্থানীয় নির্বাচনসমূহ

❑ গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকারের নির্বাচন

বাংলাদেশের ৮০% অঞ্চল গ্রাম। আর গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সরকারের ৩টি ধাপ রয়েছে। যথা– (ক) ইউনিয়ন পরিষদ (খ) উপজেলা পরিষদ (গ) জেলা পরিষদ।

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন: ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান থাকেন যিনি ঐ ইউনিয়নের ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। পাশাপাশি ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সদস্য এবং প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট ৩ জন সংরক্ষিত মহিলা আসনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে মোট ১৩ জন প্রতিনিধি সবাই প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন।

(খ) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন: ১৯৯৮ সালের উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান ও ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এছাড়াও উপজেলার অধীনে থাকা সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ উপজেলা পরিষদের মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন।

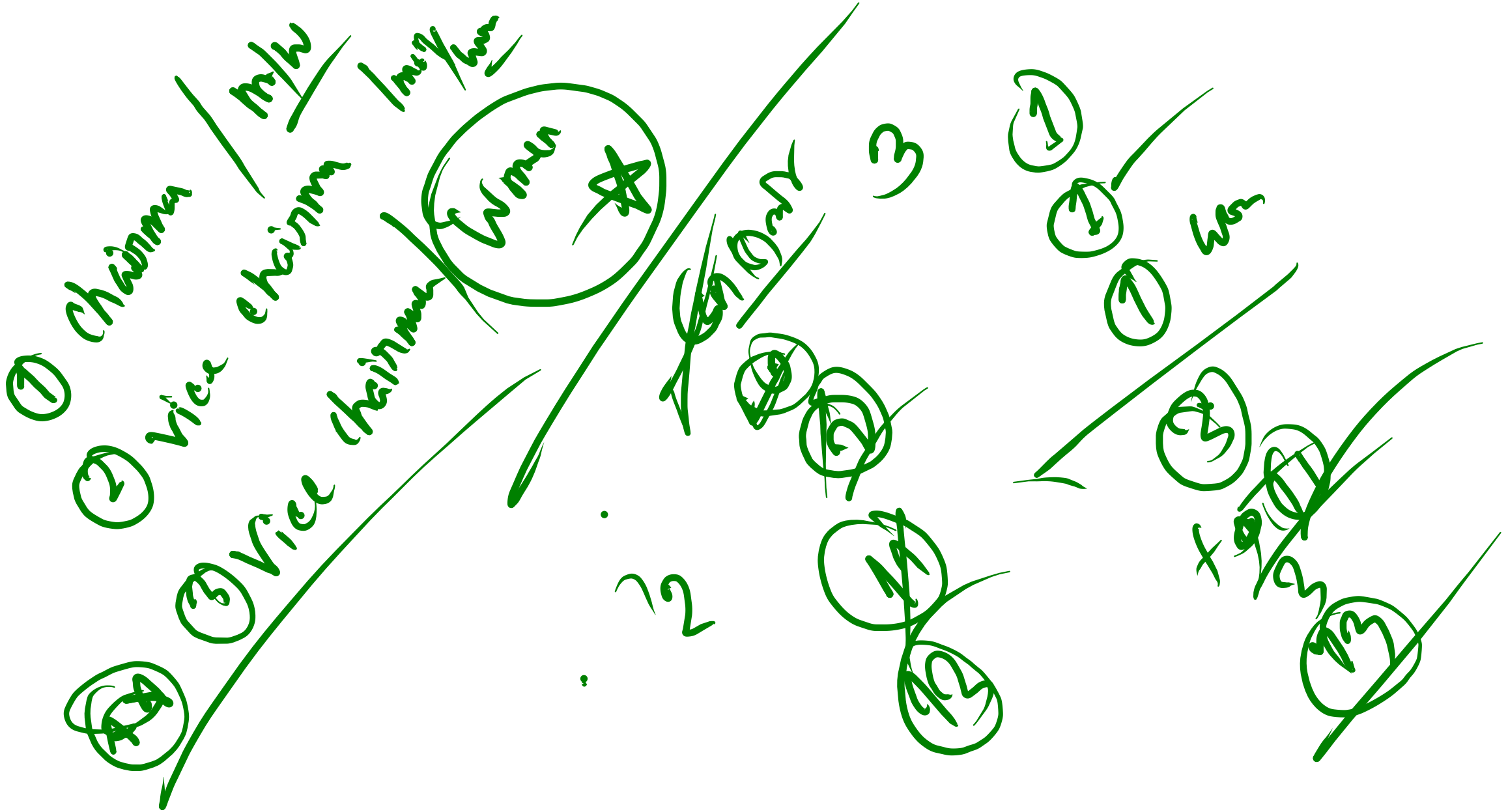

① Chairman | m/w

② Vice chairman | m/w

③ Vice chairman | Women ☆

④

3

①

①

① wm

③

⑪

⑫

⑬

2

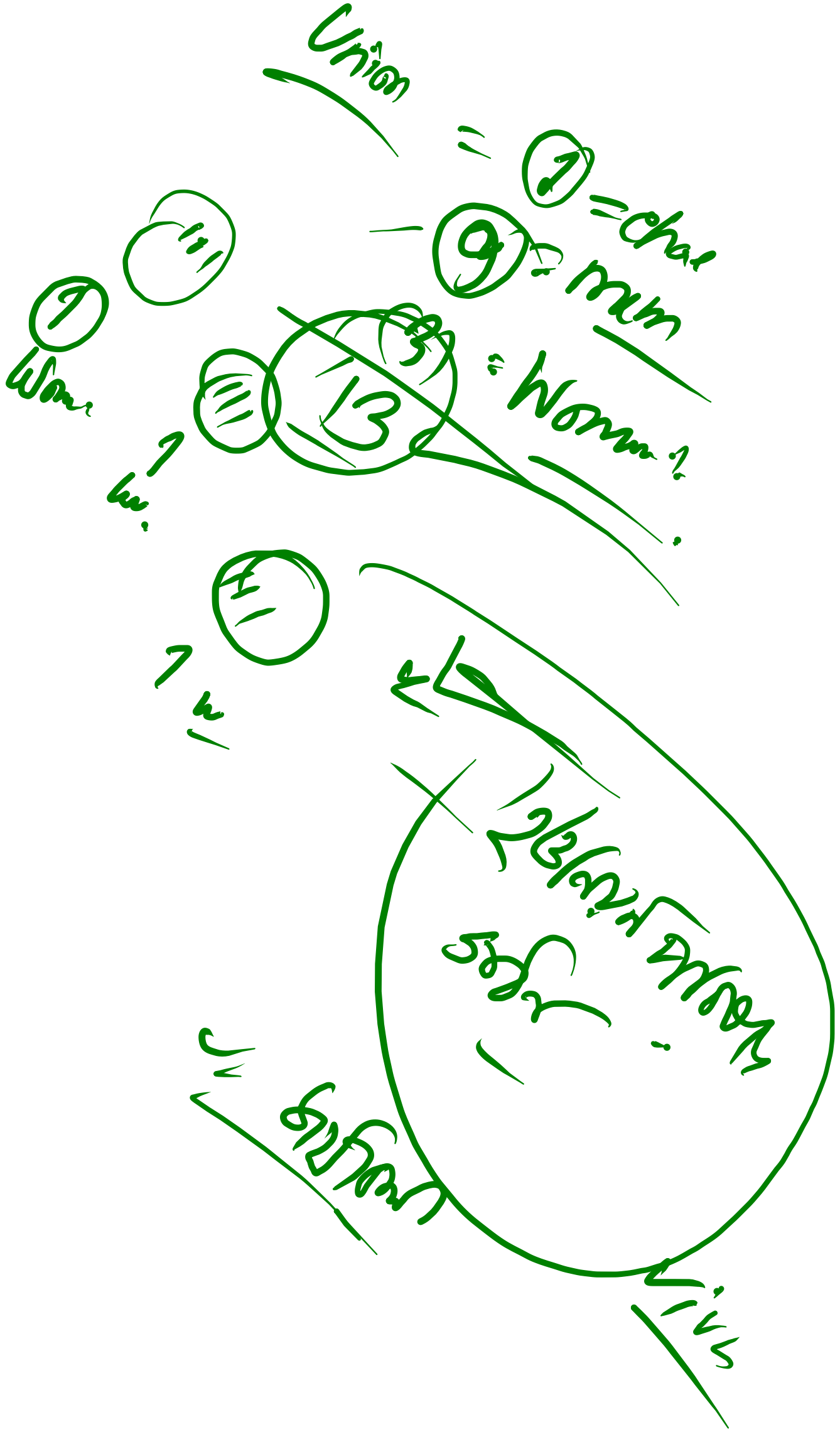

Union
13
Virus

স্থানীয় নির্বাচনসমূহ

(গ) জেলা পরিষদ নির্বাচন: 'জেলা পরিষদ আইন, ২০০০' অনুযায়ী প্রতি জেলায় ১৫ জন সাধারণ সদস্য এবং ৫ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য থাকার বিধান ছিল। এটি সংশোধন করে 'জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল-২০২২' এর মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা থেকে (জেলার মোট উপজেলার সমসংখ্যক) একজন করে সদস্য এবং চেয়ারম্যানসহ সদস্যদের মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ (নিকটবর্তী পূর্ণসংখ্যা) ও কমপক্ষে ২ জন নারী সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যে একমাত্র জেলা পরিষদের সদস্যরাই সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন না। জেলার নির্বাচিত সংসদ সদস্য, জেলার অন্তর্ভুক্ত সকল উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে কাজ করেন। অর্থাৎ নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারাই জেলা পরিষদের সদস্যরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এছাড়াও জেলার অধিবাসীদের মধ্য থেকে মনোনীত সদস্য ও মহিলা সদস্যদের নিয়োগ দেয় সরকার।

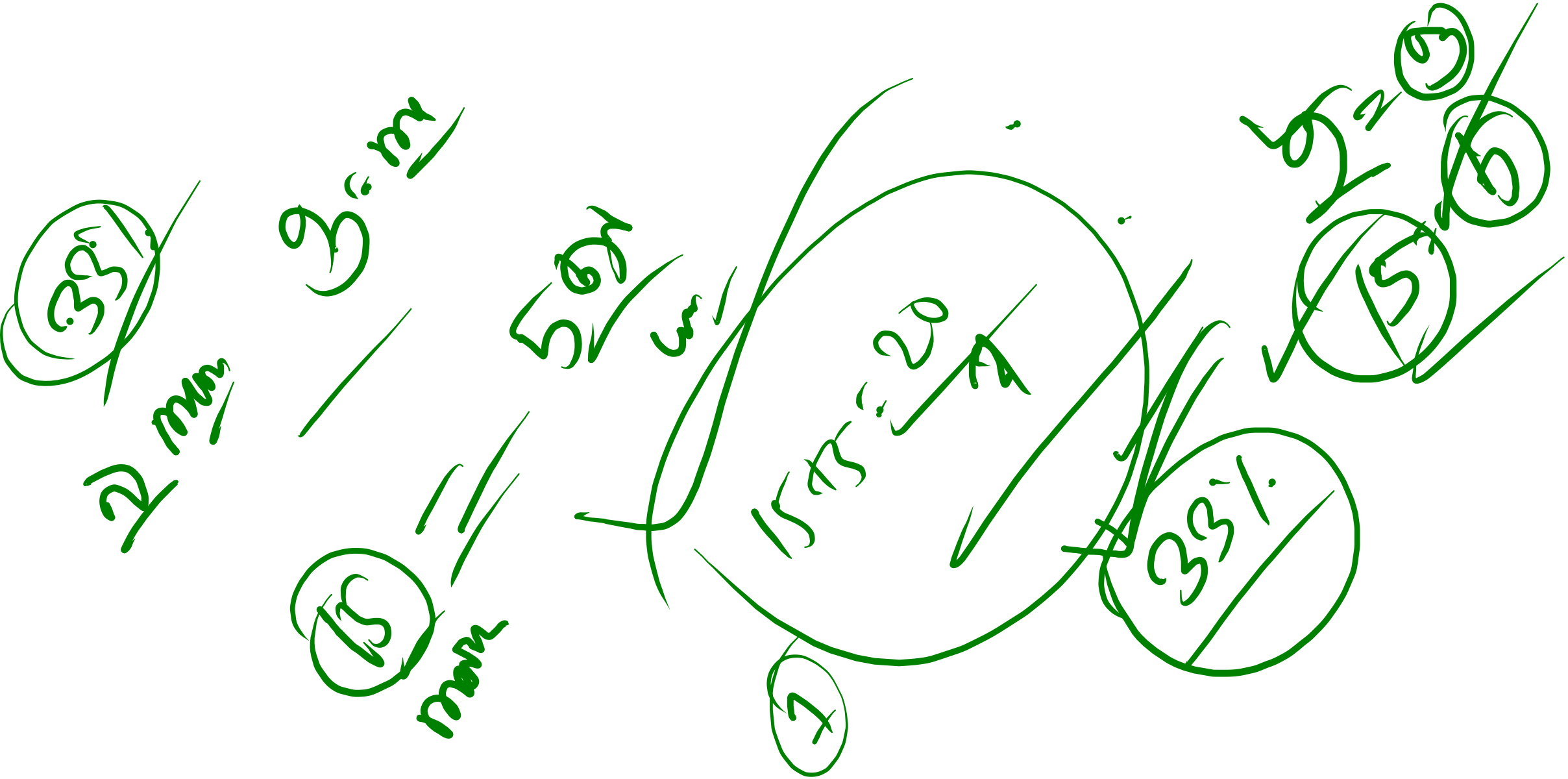

স্থানীয় নির্বাচনসমূহ

❑ শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকারের নির্বাচন

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে স্থানীয় সরকারের দুইটি কাঠামো রয়েছে। যথা– (ক) পৌরসভা (খ) সিটি কর্পোরেশন।

✓ **পৌরসভা নির্বাচন:** পৌরসভা হলো শহর এলাকায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর। ২০০৯ সালের পৌরসভা আইন অনুসারে, কোন এলাকার জনসংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি হলে, জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ অকৃষিজ পেশায় নিয়োজিত থাকলে এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৫০০ এর বেশি হলে তাকে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। পৌরসভার প্রধানকে বলা হয় মেয়র। প্রতিটি পৌরসভা কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। মেয়র এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কমিশনার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। মেয়র ও কমিশনার নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কয়েকজন মহিলা কমিশনার মনোনীত হন যাদের সংখ্যা মোট কমিশনারের সংখ্যার এক-দশমাংশের বেশি হবে না।

✓ **সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন:** পৌরসভা এলাকায় নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি করা হয়। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুসারে সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে মেয়র ও সদস্যদের কাউন্সিলর হিসেবে অভিহিত করা হয়। মেয়র ও কাউন্সিলর উভয়ই সরাসরি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

অন্যান্য নির্বাচন

❑ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় উভয় ব্যবস্থার কারণে বহুবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা হয়েছে। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান চালু করা হয়। সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমানে সংসদ সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। একই অনুচ্ছেদে কোনো ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচনের যোগ্যতাও উল্লেখ করা হয়েছে:

- বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি হতে হবে।
- সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচনের যোগ্যতা থাকবে।
- এই সংবিধানের অধীনে পূর্বে কখনও রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অভিশংসিত হতে পারবে না।

এসকল যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত করতে পারেন। সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত না হলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় থাকে।

অন্যান্য নির্বাচন

❑ সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন

সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে বর্তমানে ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসন রয়েছে। সংসদের আসনের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত এই মহিলা আসনে রাজনৈতিক দল বা জোটগুলো তাদের নির্ধারিত আসনের জন্য একক প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ায় তারা বিনা ভোটে নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের মতো সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনে তফসিল ঘোষণার প্রয়োজন পড়লেও ভোটার ও আসন বণ্টনসহ কমিশনকে এই নির্বাচনের নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এ বিষয়টি জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আইন অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হয়।

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন আইন-২০০৪ অনুযায়ী, সাধারণ নির্বাচনের মতো সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করতে হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা রিটার্নিং অফিসার নিয়োগপ্রাপ্ত হন। আইন অনুযায়ী শপথ নেওয়া সংসদ সদস্যরাই সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে ভোটার হবেন এবং এই ভোটাররা কেবল নিজেদের দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে বণ্টিত আসনে একক প্রার্থী হলে ভোটগ্রহণের প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু বণ্টিত আসনের তুলনায় ওই দল বা জোটের প্রার্থী বেশি হলে ভোট নিতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া প্রার্থীরাই নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন।

❑ **স্ট্র ভোট:** স্ট্র ভোট বলতে বুঝায় একধরনের বেসরকারি ভোট যা মূলত জনমত যাচাই এর একটি অনানুষ্ঠানিক জরিপ। এটি কোনো সংস্থা বা গণমাধ্যম কর্তৃক আয়োজিত হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জনগণের মতামত বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং রাজনীতিবিদদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত জানতে এবং ভোট পেতে করণীয় কী তা সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

নির্বাচনী আচরণবিধি

☐ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২/ 'The Representation of People' Order (RPO)

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রধান আইন। এই আইনের মাধ্যমে নির্বাচনের বিধিবিধান পরিচালিত হয়। নিচে এই আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ উল্লেখ করা হলো-

- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এ আদেশের ৩ ধারায় উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।
- আদেশের ৫ ধারাবলে নির্বাচন কমিশন যেকোনো ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষকে তার যেরূপ দায়িত্ব পালন এবং যেরূপ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন সেরূপ দায়িত্ব বা সহায়তা প্রদানে নির্দেশ দিতে পারেন।
- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন এক বা একাধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য নির্বাচনের জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন। বিধিবিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারের উপর ন্যস্ত। সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণও রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে রিটার্নিং অফিসারের কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী।

নির্বাচনী আচরণবিধি

- ✓ নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কোনো কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাধা দান বা নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার মতো কোনো কাজ করলে, নির্বাচন কমিশন যেকোনো সময় নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাকে বা তাদের অব্যাহতি দিতে পারবেন এবং প্রয়োজনে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন।
- ✓ ৯ ধারায় রিটার্নিং অফিসারকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি প্যানেল তৈরির কথা বলা হয়েছে।
- ✓ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১১ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ নির্ধারণ ও প্রচারে নির্বাচন কমিশনকে প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।
- ✓ ১২(১) ধারায় জাতীয় সংসদের সদস্যপদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে।
- ✓ ১৩ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী স্বয়ং কিংবা বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঙ্কের জামানত প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে।
- ✓ ১৪ ধারায় মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত হয়েছে।
- ✓ ১৪(৫) ধারায় রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়েরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

BCS
1st
UNO
DC
UNO
Police
EM
JM
Admin
26

নির্বাচনী আচরণবিধি

- ✓ ১৫ ধারায় বৈধ মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের কথা বলা হয়েছে।
- ✓ ১৬(১) ও ১৬(২) ধারা অনুসারে বৈধভাবে মনোনীত যেকোনো প্রার্থী তার নিজ স্বাক্ষরে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।
- ✓ আদেশের ১৭ (১) ধারায় বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচন বাতিলের কথা বলা হয়েছে।
- ✓ ১৯ ধারায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার শর্ত বর্ণিত হয়েছে।
- ✓ ২০ ধারায় নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পছন্দ অনুসারে প্রতীক বরাদ্দের বিধান রয়েছে।
- ✓ ২০ (২) ধারা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্পর্কিত পোস্টার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শন করতে হবে।
- ✓ ২১ (১) ধারায় প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী এজেন্ট এবং ২১ (২) ধারায় পোলিং এজেন্ট নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে।
- ✓ ২৭ (২) ধারা অনুসারে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর ৮ ধারার (২), (৩) অথবা (৪) উপধারায় বর্ণিত ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের অধিকার দেয়া হয়েছে।

নির্বাচনী আচরণবিধি

- ✓ আদেশের ৩৭ ধারায় প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার ফলাফল একত্র করা এবং ৩৭ (৫) ধারায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা তার প্রতিনিধির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট পুনঃগণনার বিধান রয়েছে।
- ✓ ৩৯ (১) ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন।
- ✓ ৪৪-ক ধারার (১) উপধারা অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের উৎস-বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেবেন।
- ✓ ৪৪-খ ধারার (৩) উপধারায় প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা (সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা) নির্ধারিত হয়েছে।
- ✓ ৪৪-গ ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনি ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এবং নির্বাচনি এজেন্টদের নির্দেশ দেবেন।
- ✓ ৪৯(১) ধারা অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যেকোনো প্রার্থী নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।
- ✓ আদেশের ৭৩ ধারায় ৪৪-ক ও ৪৪-খ এর বিধান লঙ্ঘন, ঘুষ গ্রহণ, ছদ্মবেশ ধারণ, নির্বাচনে অসঙ্গত প্রভাব খাটানো, কোনো প্রার্থীর নির্বাচনি সাফল্যে বিঘ্ন সৃষ্টি বা তার নিজস্ব বা আত্মীয়স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর প্রতীক বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর বিশেষ সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানের আহ্বান বা প্ররোচিতকরণ, ভোটার উপস্থিতিতে বা ভোটদানে বাধা দান এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘুষ গ্রহণকে দুর্নীতিমূলক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

নির্বাচনী আচরণবিধি

- ✓ ৭৪ ধারায় বেআইনি আচরণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং এর জন্য জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।
- ✓ ৭৮ ধারায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিবাগত মধ্যরাত থেকে পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনি এলাকাভুক্ত সকল স্থানে জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান ও তাতে যোগদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এ বিধান লঙ্ঘিত হলে ৭৮(২) ধারা অনুসারে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর এবং সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদণ্ড হতে পারে।
- ✓ ৮০ ধারায় ভোটকেন্দ্রের কাছে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য জরিমানাসহ ঊর্ধ্বে ৩ বছর, নিম্নে ৬ মাস কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে (কগনিজিবল অফেন্স)।
- ✓ ৮১(১) ধারায় ব্যালট চুরি, জালভোট দান, সীলমোহর ভেঙে ফেলা, নির্বাচন পরিচালনায় বাধা দান প্রভৃতি অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে (কগনিজিবল অফেন্স)।
- ✓ আদেশের ৮৪ ধারায় বলা হয়েছে, নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করলে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন (কগনিজিবল অফেন্স)।

নির্বাচনী আচরণবিধি

- ✓ ৮৬ ধারায় বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত থেকে কোনো ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করলে তিনি জরিমানাসহ ঊর্ধ্বে ৫ বছর, নিম্নে ১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।
- ✓ ৯১ ধারা অনুসারে বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন এবং চাপসহ অন্যায় আচরণমূলক কার্যকলাপ চালু থাকার কারণে সুষ্ঠু ও আইনসম্মতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হলে নির্বাচন কমিশন সে পর্যায়ে যেকোনো ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করতে পারেন।

৯১-খ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে অনিয়ম রোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারী কমিটি গঠন করতে পারবেন। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত এ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পূর্বেই তদন্ত পরিচালনা করবে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে রিপোর্ট পেশ করবে।

পর্যবেক্ষকের ভূমিকা

❑ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২০১৭ সালে "নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০১৭" প্রণয়ন করে। এটি অনুসারে:

✓ **নির্বাচন পর্যবেক্ষক:** নির্বাচন কমিশনের অধীন যে কোনো নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশন বা কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নির্বাচন পর্যবেক্ষক বলা যাবে।

✓ **নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা:** বাংলাদেশের কোনো আইনের অধীনে নিবন্ধিত যেসকল সংস্থা নির্বাচন কমিশন হতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত সেগুলোকে নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা বলা যাবে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য দুই বা ততোধিক সংস্থা একটি গ্রুপ কিংবা পার্টনারশিপ গঠন করলে, ঐ গ্রুপ বা পার্টনারশিপকে একক পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হবে।

✓ **নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য:** নির্বাচন কমিশন প্রধানত তিনটি কারণে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করে –

- নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি হলে তা সম্পর্কে জানা।
- নির্বাচন সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা সম্পর্কে জানা।
- নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জানা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পর্যবেক্ষকের ভূমিকা

✓ **নির্বাচন পর্যবেক্ষকের যোগ্যতা:** নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে একজন ব্যক্তির যে সকল যোগ্যতা প্রয়োজন –

- বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
- বয়স ২৫ বা তার বেশি হতে হবে।
- ন্যূনতম SSC বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।
- নির্বাচনে প্রার্থী হবার যোগ্যতা থাকতে হবে।

✓ **পর্যবেক্ষকের নিবন্ধন বাতিল:** নিবন্ধিত পর্যবেক্ষক ব্যক্তি বা সংস্থার নিবন্ধন যে সকল কারণে বাতিল হতে পারে –

- পর্যবেক্ষণ নীতিমালা লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে।
- রাষ্ট্র ও শৃঙ্খলা বিরোধী কোনো কাজে জড়িত হলে।
- পর পর দুইটি সাধারণ নির্বাচনে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন না করলে।

সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা

❑ সরকারের ভূমিকা

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন, সাংবিধানিক ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ নির্বাচন কমিশনকে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা করতে বাধ্য। তাছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো বৃহৎ নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে কঠিন। নির্বাচনের প্রাণ হলো ভোটার অর্থাৎ জনগণ। তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য জনগণের সহযোগিতাও অপরিহার্য। নিম্নে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

❑ হস্তক্ষেপ না করা

বাংলাদেশে বিতর্কিত নির্বাচনের মূল কারণ হলো সরকারের হস্তক্ষেপ। সরকার অনেক সময় বিভিন্নভাবে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচন কমিশন গঠন, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের মতো বিষয়গুলোতে সরকারের হস্তক্ষেপ এর নজির দেখা যায়। এসবের ফলে নির্বাচন কমিশনের প্রতি জন আস্থার অভাব সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে দেখা যায়, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারে। তাই প্রত্যেক ক্ষমতাসীন দলের উচিত নির্বাচন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।

[illegible]

[illegible] =

[illegible] =

সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা

❑ পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ

নির্বাচন কমিশনে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। জনবল ঘাটতির কারণে নির্বাচন কমিশনকে বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলো পরিচালনা করতে বেগ পেতে হয়।

❑ আইনের যথাযথ প্রয়োগ

বাংলাদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত অনেক আইন ও বিধি রয়েছে। কিন্তু অনেক সময়ই এর যথাযথ প্রয়োগ দেখা যায় না। এর একটি কারণ তা হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ ব্যাপারে সচেতন না হলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এককভাবে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো অসম্ভব।

❑ নির্বাচনে সামরিক বাহিনী মোতায়েন না করা

সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের গর্ব। তাঁদেরকে বেসামরিক প্রয়োজনে যত কম নিয়োগ করা যাবে তাদের পেশাদারিত্ব তত হ্রাস পাবে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে পরিচালনা করতে পারলে নির্বাচনি শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসাধ্য নয়।

নাগরিকের কর্তব্য ?

(১) ভোট দেওয়া
(২) (যথা) রাষ্ট্রীয় কর দেওয়া
(৩) দেশের আইন মেনে চলা
(৪) শৃঙ্খলা বজায় রাখা

নির্বাচনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

☐ জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)

'জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০' অনুযায়ী 'জাতীয় পরিচয়পত্র' অর্থ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কোনো নাগরিককে প্রদত্ত পরিচয়পত্র। সরকারি গেজেটে উল্লিখিত সেবা প্রাপ্তির জন্য নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন ও অনুলিপি প্রদানের আইন এটি। তবে কোনো এলাকায় জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান সম্পূর্ণ না হলে কোনো নাগরিককে সুবিধা পেতে পরিচয়পত্র প্রদানে কেউ বাধ্য করতে পারবে না। ২০০৮ সালে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের পর ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি যাদের বয়স ১৮ বা তার বেশি তাদের ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়। সে সময় প্রদত্ত জাতীয় পরিচয়পত্রে ব্যক্তির নাম, পিতা মাতার নাম, নারীদের ক্ষেত্রে স্বামীর নাম, রক্তের গ্রুপ এবং বর্তমান ঠিকানার উল্লেখ ছিল। এটি মূলত একজন নাগরিকের নাগরিকত্ব প্রকাশ করে। ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাংক একাউন্ট খোলা, ঋণ গ্রহণ, জমি কেনা-বেচা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নির্বাচনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

❑ স্মার্ট এন. আই. ডি (SNID)

জাতীয় পরিচয় পত্রের উন্নত ধরন (স্মার্ট এন আই ডি) প্রদান শুরু হয় ২০১৬ সালে। স্মার্ট এন আই ডি'তে ব্যক্তির নাম (বাংলা ও ইংরেজিতে), পিতা-মাতার নাম, জন্ম তারিখ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নিবন্ধন নং আছে। কার্ডের বিপরীত পাশে ভোটার এলাকার ঠিকানা, রক্তের গ্রুপ এবং জন্ম স্থান উল্লেখ আছে। এর সাথে কার্ডে ইলেকট্রনিক চিপ আছে, যাতে মেশিন রিডেবল ৩২ রকমের তথ্য আছে। এই পরিচয়পত্রের মেয়াদ ১০ বছর এবং নারীদের ক্ষেত্রে স্বামীর নাম প্রদর্শন লিঙ্গবৈষম্যের অংশ বলে তা স্মার্ট এন. আই. ডি তে দৃশ্যমান নেই। এই কার্ডে তিন স্তরে ২৫টি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো খালি চোখে দৃশ্যমান, দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য মেশিন রিডেবল এবং তৃতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য ফরেনসিক টেস্ট প্রয়োজন। সরকারি ২২টি সেবার জন্য স্মার্ট কার্ড বাধ্যতামূলক। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আয়করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর প্রাপ্তি, শেয়ার আবেদন ও বিও হিসাব খোলা, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি, পাসপোর্ট আবেদন ও নবায়ন, যানবাহন রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স আবেদন, চাকরি আবেদন, বিয়ে-তালাক রেজিস্ট্রেশন প্রভৃতি।

নির্বাচনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

❑ ই ভি এম (EVM)

১৯৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৭টি অঙ্গরাজ্যে প্রথমবারের মতো ইভিএম বা ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ইউরোপের অনেক দেশে জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম এর ব্যবহার লক্ষণীয়। বাংলাদেশে ২০০৭ সালে অফিসার্স ক্লাবের কার্যকরী সংসদ নির্বাচনে ইভিএম এর সাহায্যে ভোট গ্রহণ করা হয়। তৎকালীন বুয়েটের আইআইসিটি বিভাগের প্রধান ড. এস এম লুৎফুর কবির ও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পাইল্যাবস ইভিএম প্রকল্পটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে জমা দেন। কিন্তু সে সময় ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শেষ না হওয়ায় কোনো নির্বাচনে ব্যবহৃত হয়নি। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশনার এটি এম শামসুল হুদা ২০১০ সালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে পরীক্ষামূলক ১৪টি কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহারের অনুমতি দেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনার রকিবউদ্দীন আহমেদের সময় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারে জটিলতা তৈরি হওয়ায় ইভিএম প্রকল্পটি বাতিল করে বিদেশ থেকে ইভিএম ক্রয়ের পরামর্শ প্রদান করা হয়। ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন ইভিএম কিনতে শুরু করে। ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে সর্বোচ্চ ১৫০টি আসনে ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের কাছে থাকা ১.৫ লাখ ইভিএম এর সাথে আরো ২ লাখ ইভিএম প্রয়োজন, যার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৮.৭১১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। নির্বাচনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ব্যালট পেপার ব্যবহারের পরিবর্তে ইভিএম ব্যবহার বিতর্কিত।

নির্বাচনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

ইভিএম কীভাবে কাজ করে: EVM মূলত দুটি যন্ত্রের সমন্বয়ে কাজ করে, কন্ট্রোল ইউনিট ও ব্যালেটিং ইউনিট। ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিট পরিচালনা করেন। প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট ইউনিট সক্রিয় করার পরেই ভোটার ব্যালট ইউনিট ব্যবহার করে ভোট প্রদান করতে পারবে। পরবর্তী ভোট প্রদানের জন্য প্রিজাইডিং অফিসারকে পুনরায় কন্ট্রোল ইউনিট থেকে ব্যালট ইউনিটে পারমিশন প্রদান করতে হবে। এতে ভোট দাতা ভুল করেও একাধিক বাটন চেপে একাধিক ভোট দিতে পারবেন না।

ইভিএম ভোট গ্রহণের জন্য ভোটারের ফিঙ্গার প্রিন্ট নির্বাচন কমিশনে থাকা প্রার্থীর তথ্যের সাথে মিলিয়ে ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত করে। ভোট প্রদানের জন্য এটি আবশ্যকীয় ধাপ। ভোটারের আঙ্গুলের চাপ না মিললে বা একই ভোটার একবার ভোট প্রদানের পর একাধিক ভোট প্রদানের চেষ্টা করলে মেশিন ভোট গ্রহণ করবে না। এতে একজনকে একাধিক ভোট প্রদান থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি একজনের ভোট অন্যজন প্রদান করাও প্রতিহত করবে। নির্বাচন কমিশনের মতে, কোনো ব্যক্তি বা সংবদ্ধ চক্র যদি ভোটকেন্দ্র দখল করে বা ব্যালট ইউনিট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে তবে প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিট থেকে ব্যালট ইউনিটকে অচল করার মাধ্যমে ভোট গ্রহণ ব্যবস্থা নিরাপদ করতে পারবেন।

নির্বাচনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

➤ **ইভিএম ব্যবহারের সুবিধা:** ব্যালট পেপার ব্যবহার করে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট গ্রহণের আগে-পরে ইচ্ছামত ব্যালট বক্স ভর্তি করা সম্ভব। এর বিপরীতে ইভিএম সরাসরি নিরাপত্তা প্রদান করে। একের ভোট অন্য কেউ প্রদান, একাধিক ভোট প্রদান থেকে ভোটগ্রহণ ব্যবস্থা নিরাপদ করায় ইভিএম কাগজের ব্যালটের চেয়ে অধিক নিরাপদ। ইভিএম মেশিনের প্রোগ্রাম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেশিনের সাথে ইন্টিগ্রেটেড। এতে নতুন কোনো প্রোগ্রাম দেয়া যায় না বা প্রদত্ত প্রোগ্রামের কোনোরূপ পরিবর্তন আনা যায় না। যা ভোট কারচুপি প্রতিহত করে।

ভোটিং মেশিনটি বাইরের কোনো কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত বা ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত নয়, ফলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে মেশিনের প্রোগ্রামে ম্যালওয়্যার বা ভাইরাস স্থাপনের পথ নেই। এই মেশিনের প্রোগ্রামে কোনো পরিবর্তন মূলত ইভিএম এর প্রতি অবিশ্বস্ততার প্রধান কারণ। কিন্তু প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা, নির্বাচনে ব্যবহারের পূর্বে নির্মাতা কর্তৃক নিরীক্ষা মিশনের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। এছাড়াও ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সময় সংক্ষেপণ, সহজবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে ব্যালট পেপারের চেয়ে ইভিএম সুবিধাজনক।

নির্বাচনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

- **ইভিএম ব্যবহারের সমস্যা:** পৃথিবীর অনেক দেশেই ইভিএম ব্যবহৃত হলেও তাদের তুলনায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভিন্ন। ডিজিটাল ভোটিং মেশিন ইউরোপে জনপ্রিয়, সেখানে রাজনৈতিক পরিবেশ শান্ত ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঠিক তার বিপরীত। অবিশ্বাস, কারচুপি, অশ্রদ্ধাশীল এরূপ রাজনৈতিক পরিবেশে বিতর্কিত ব্যবস্থা ইভিএম ব্যবহার নির্বাচন নিয়ে সংশয়ই বৃদ্ধি করবে। তার সাথে ইভিএম ব্যবহারে উচ্চ ব্যয় এবং মেশিন পরিচালনার জন্য দক্ষ লোকের অভাব সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। ইভিএম এ ভোট টেম্পারিং এর অভিযোগের বিপরীতে রাজনৈতিক দলগুলো মেশিনে অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তি পরীক্ষার অনুমতি চায়। কিন্তু এতে সমস্যা হলো এটি রাজনৈতিক দলগুলোকে মেশিনের প্রোগ্রাম পরিবর্তনের সুযোগ পাবে, যা মেশিন ব্যবহারের প্রধান কারণ নিরপেক্ষতাকে পর্যবসিত করে।

মেশিনের আরেকটি সমস্যা হলো, ইভিএম নিরীক্ষণযোগ্য নয়। ভোট নিয়ে সংশয় তৈরি হলে এটি পুনর্গণনা বা নিরীক্ষা করার সুযোগ নেই। নতুন কিছু মেশিনে পেপার অডিট ট্রেল ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে ভোটার নিশ্চিত হতে পারেন যে তাঁর ব্যালেট গণনার জন্য সংরক্ষিত হবে। ভেরিফিয়েল পেপার অডিট ট্রেল বা ভিভিপিএটি ছাড়া নির্বাচনের ফলাফল স্বাধীনভাবে অডিট করার উপায় নেই। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের আরেকটি ঝুঁকি হলো মেশিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে রাজনৈতিক দলে যোগসাজশ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বেসরকারি ইভিএম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নিজেরা অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

নির্বাচনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে প্রায় ১০ শতাংশ ভোটার ইভিএম এর ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যার পেছনে রয়েছে মেশিন ব্যবহারের দুর্বোদ্ধতা এবং যান্ত্রিক ত্রুটি। কাগজের ব্যালট পেপারে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি নেই, কিন্তু ইলেকট্রনিক জিনিসে যেকোনো সময় ত্রুটি/ জটিলতা দেখা দিতে পারে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন চলাকালীন ইভিএম মেশিনে কোনো মেইটেনেন্স কাজ নিষিদ্ধ, ফলে কোনো যান্ত্রিক গোলযোগের সমাধান প্রিজাইডিং অফিসার করতে না পারলে কিংবা বিকল্প মেশিনের ব্যবস্থা না থাকলে উক্ত কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সম্ভব নয়।

নাগরিকের ভূমিকা

❑ ভোটার তালিকা প্রণয়নে কমিশনকে সহযোগিতা

নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে বিজ্ঞপ্তি ও মাইকে ঘোষণা দিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা রাখে। নিকটবর্তী নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ভোটার নিবন্ধনের কাজ হয়ে থাকে। তাই ১৮ বা তার বেশি বয়সের সকল নাগরিকের উচিত সেখানে গিয়ে ভোটার নিবন্ধন করা।

❑ নির্বাচনি আচরণবিধি অনুসরণ করা

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ সাধারণ জনগণ নির্বাচনি আচরণ বিধি মেনে চললে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনি মাঠে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব খাটিয়ে আচরণবিধি ভঙ্গ করে। যেমন অর্থ ও পেশী শক্তির ব্যবহার, যততত্র পোস্টার লাগানো, যখন তখন মাইকে প্রচার, অবৈধ অস্ত্র বহন ছাড়াও নানাভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়ে থাকে। সচেতন নাগরিকদের উচিৎ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

নাগরিকের ভূমিকা

❑ বিবেকবান ভোটার হওয়া

সচেতন ও বিবেকবান ভোটার দেশের সম্পদ। কেননা তাঁদের মাধ্যমে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া সম্ভব। যোগ্য প্রতিনিধি, দেশ ও জনগণের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। অসৎ পন্থা বা প্রলোভনে সহায়তাকারী ভোটার কখনো যোগ্য প্রার্থী বাছাই করতে পারে না। এ ধরনের অসচেতন ভোটারের কারণে দেশের ক্ষতি হয়।

নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য সরকার ও নাগরিক উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একদিকে সরকার নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি সহযোগিতা করতে পারে। এক্ষেত্রে সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপকে পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যদিকে জনগণ, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

গণতন্ত্র ও রাজনীতির ধারণা

❑ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

❖ গ্রিক ঐতিহাসিক **হিরোডোটাস** বলেন –

"গণতন্ত্র এক প্রকার শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণি বা শ্রেণিসমূহের উপর ন্যস্ত থাকে না, বরং সমাজের সদস্যগণের উপর ব্যাপকভাবে ন্যস্ত হয়।"

❖ চিন্তাবিদ **লর্ড জেমস ব্রাইস** বলেন –

"ঐ শাসনব্যবস্থাই গণতান্ত্রিক, যা জনসাধারণের ইচ্ছা, তাদের মঙ্গল-অমঙ্গল ও হিতকর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং যেখানে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রাধান্য পায়।"

❖ সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট **আব্রাহাম লিংকন। তাঁর মতে,**

"Democracy is a Government of the People, by the People, for the People."

("গণতন্ত্র হল, জনসাধারণের দ্বারা, জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।")

গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ: প্রাচীন থেকে বর্তমান

❑ প্রাচীনযুগে গণতন্ত্র

প্রাচীন গ্রীসের কয়েকটি নগর রাষ্ট্রে ও রোমে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিস দেশে 'গণতন্ত্র' শব্দটি সর্ব প্রথম ব্যবহৃত হয়। গ্রিক ঐতিহাসিক থুসিডাইডিস তাঁর পেলোপোনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাসে গণতন্ত্র শব্দটি উল্লেখ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হেরোডোটাস নামে এক গ্রিক ঐতিহাসিক গণতন্ত্রের ধারণার আলোচনায় 'বহুজনের শাসন' এবং সমাজে 'সম অধিকার' এর কথা বলেছেন। এই সময় ক্লিওন নামে আর একজন গ্রিকপণ্ডিত গণতন্ত্রকে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন বলে উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক পেরিক্লিস এথেন্সের গণতন্ত্রকে আদর্শ গণতন্ত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। তবে আধুনিক যুগের গণতন্ত্রের সাথে তুলনা করলে প্রাচীন গ্রিস ও রোমের গণতন্ত্রকে অভিজাততন্ত্রই বলা যেতে পারে। কারণ সেসময় নারীদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না, ক্রীতদাস ও বিদেশীদের নাগরিক অধিকারই ছিল না। অথচ মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই তখন দাস হিসেবে গণ্য হতো। দেখা যেতো যে সমাজের অভিজাত ও কুলীন সদস্যরাই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে, শ্রমিক বা কৃষকশ্রেণির অংশগ্রহণের অধিকার অত্যন্ত সীমিত ছিল।

গ্রীসের মতো প্রাচীনকালে ভারতেও গণতন্ত্রের ধারণার সৃষ্টি হয়। প্রাচীনকালে ভারতের সমাজব্যবস্থাতেও গণতান্ত্রিক সংস্থা ও রীতিনীতির অস্তিত্ব দেখা গেছে। বৈদিক যুগে এবং পৌরাণিক যুগে 'সভা', 'সমিতি' প্রভৃতি গণতান্ত্রিক সংস্থা বর্তমান ছিল। সেই সময় প্রজা সাধারণের বিশেষ অধিকার স্বীকার করা হতো। এ বিষয়ে পৌরাণিক যুগের ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ সমাজেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়।

গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ: প্রাচীন থেকে বর্তমান

❑ মধ্যযুগে গণতন্ত্র

প্রাচীন গ্রিস ও রোমের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গণতন্ত্র সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা দেখা যায়নি। পৃথিবীর সকল অঞ্চল মাঝের এই সময়টায় মূলত রাজতন্ত্রের মাধ্যমে শাসিত হতো। তবে ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা ও সামন্তদের মধ্যে স্বাক্ষরিত রাজার ক্ষমতা সংকোচন সংক্রান্ত Magna Carta বা মহাসনদ, ১৬৮৮ সালের Glorious Revolution বা গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব আধুনিক গণতান্ত্রিক ধারণার বিকাশে সাহায্য করেছে। আধুনিক অর্থে গণতান্ত্রিক ধারণার সূত্রপাত ঘটে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ধনতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাতের সময় থেকে। ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা" কে গণতান্ত্রিক আদর্শ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীতে। তবে বহুল চর্চিত শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের ধারণাটি প্রতিষ্ঠা অর্জন করে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ: প্রাচীন থেকে বর্তমান

❑ আধুনিক গণতন্ত্র

আধুনিক যুগে , অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে বেশ কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকের হাত ধরে গণতন্ত্র একটি স্থায়ী শাস্ত্রীয় রূপ পায়। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত দার্শনিক **থমাস হবস** তাঁর সামাজিক চুক্তির (Social Contract Theory) ভিত্তিতে জনগণের দ্বারা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। আধুনিক গণতন্ত্রের জনক হিসেবে বিখ্যাত **জন লক** এর মতবাদে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দর্শনের তাত্ত্বিক সমর্থন বর্তমান। ফরাসি দার্শনিক **জঁ-জাক রুশো** এর General Will বা 'সাধারণ ইচ্ছা' মতবাদ গণতন্ত্রের ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে। সে সময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) এবং হিতবাদ (Utilitarianism) ধারণাগুলোর বিকাশ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পিছনে সমর্থন যুগিয়েছে। দুই ব্রিটিশ রাজনৈতিক বিজ্ঞানী **জেরেমি বেন্থাম** ও **জেমস মিল** 'সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণ' (Greatest good of the greatest number)-এর তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁরা প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের কথাও বলেন। তবে **জন স্টুয়ার্ট মিল** এর হাতেই উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার ও স্ত্রী জাতির ভোটাধিকারের উপর স্টুয়ার্ট মিল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ: প্রাচীন থেকে বর্তমান

❑ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

গণতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোর মানদণ্ডে সহজেই কোনো শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক কিনা তা বিচার করা যায়। যেমন:

❑ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরকার গঠন

আধুনিক গণতন্ত্রের প্রথম শর্তই হলো রাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে সরকার নির্বাচিত হতে হবে। যেহেতু বর্তমানে বিশাল জনসংখ্যার কারণে সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই তাই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনই একজন সাধারণ নাগরিকের রাষ্ট্র পরিচালনায় অবদান রাখার একমাত্র উপায়। কোনো রাষ্ট্রে যদি নাগরিকেরা স্বাধীন ও অবাধে নিজের ভোটের অধিকারই প্রয়োগ না করতে পারে তাহলে সেই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়।

গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ: প্রাচীন থেকে বর্তমান

❑ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারকে পরিবর্তন

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, নির্দিষ্ট সময় পরপর শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রের সরকার পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। প্রতিটি সরকারের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে এবং মেয়াদ শেষ হবার পর ক্ষমতাসীন সরকার স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ায়। এরপর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন একটি সরকার ক্ষমতায় আসার ব্যবস্থা থাকে। আবার একই সরকার পুনরায় নির্বাচিতও হতে পারে সকল শর্ত পালন করে। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সুযোগ নিয়মতান্ত্রিক ও মসৃণ থাকতে হবে একটি সার্থক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়।

❑ দল গঠন, মত প্রকাশ ও সমালোচনার অধিকার

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র চর্চার সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকবে রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক আইন ও রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অধিকার ভোগ করবে। পাশাপাশি সবার নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার থাকবে, গণমাধ্যমের বাকস্বাধীনতা থাকবে দেশের পরিস্থিতি সঠিক ভাবে তুলে ধরার জন্য। প্রত্যেকের স্বাধীনতা থাকবে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মত প্রকাশ ও বাকস্বাধীনতার উপর কড়াকড়ি বা বাধানিষেধ থাকলে গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব হয় না।

গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ: প্রাচীন থেকে বর্তমান

❑ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্বার্থরক্ষা

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিককে সমান মর্যাদা ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হবে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ কোন কিছুর ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না। নাগরিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সবাই সমানভাবে বিবেচিত হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন থাকে। ফলে কোন নাগরিকই বিনা বিচারে কোন শাস্তি পাওয়ার ভয়ে থাকেন না। যেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয় তাই এই ব্যবস্থায় জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণই মূখ্য থাকে।

বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের ধরন

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হলো যখন নাগরিকরা কোনো মধ্যবর্তী প্রতিনিধি বা সংসদ সদস্য নির্বাচন ছাড়াই সরাসরি কোনো নীতির পক্ষে ভোট দিতে পারে। সরকারকে কোনো আইন বা নীতি পাশ করতে হলে প্রতিবার তা নিয়ে জনগণের কাছে যেতে হয়। জনগণই যে কোন জাতীয় ইস্যুতে বা নতুন আইন-নীতি প্রণয়নের পক্ষে-বিপক্ষে ভোট দেয় এবং তাদের নিজেদের দেশের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। জনগণ এমনকি নিজেরাই কোন আলোচ্য বিষয় তুলে আনতে পারে, যতক্ষণ তাদের ইস্যুতে যথেষ্ট ঐকমত্য থাকে। এমনকি জনসমর্থন ছাড়া করের হারও বাড়ানো যায় না। উদাহরণস্বরূপ: প্রাচীন গ্রিস ও রোমে এ ধরনের গণতন্ত্র ছিল। বর্তমানে ইউরোপের দেশ সুইজারল্যান্ড একটি সফল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দেশ। দেশের কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় লোকেরা একত্রিত হয় এবং তাদের সমাজের আইনে ভোট দেয়।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র কে পরোক্ষ গণতন্ত্রও বলা হয়। এই ধরনের ব্যবস্থায় জনগণ তাদের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠায়। সেই প্রতিনিধিরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের পক্ষ থেকে জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ করে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে থেকে সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করেন যিনি দেশের নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বর্তমানে গণতন্ত্রের সবচেয়ে সাধারণ রূপ। ভারত, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বিদ্যমান।

বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের ধরন

❑ সংসদীয় গণতন্ত্র

যে গণতন্ত্র আইনসভাকে অধিক ক্ষমতা দেয় তাকে সংসদীয় গণতন্ত্র বলে। কার্যনির্বাহী শাখা শুধুমাত্র আইনসভা, অর্থাৎ সংসদ থেকে তার গণতান্ত্রিক বৈধতা লাভ করে। নির্বাচিত আইনসভা (সংসদ) সরকার প্রধান (প্রধানমন্ত্রী) বাছাই করে এবং যে কোনো সময় অনাস্থা ভোট পাস করে প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করতে পারে। এ-ধরনের সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান 'রাষ্ট্রপতি' এবং সরকার প্রধান 'প্রধানমন্ত্রী' থাকে এবং তাঁরা আলাদা এবং উভয়েরই ক্ষমতার ভিন্নতা রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতি হয় একজন ক্ষমতাহীন রাজা (যেমন- যুক্তরাজ্য) বা আনুষ্ঠানিক প্রধান (যেমন- বাংলাদেশ)। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে।

❑ ইসলামী গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের এই রূপটিতে একই সাথে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয়নীতিতে ইসলামী আইন প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ইসলামী গণতন্ত্রের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে-

(ক) নেতারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়। (খ) নেতা সহ সবাই শরীয়া আইনের অধীন পরিচালিত হন।

(গ) নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই 'শুরা' অনুশীলন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে, যা ইসলামী শরিয়াহ এর অনুশীলনের একটি বিশেষ রূপ।

এগুলো ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতি, যা কুরআনে সুপারিশ করা হয়েছে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পূরণকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ২য় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

"প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে"।

নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের বিভিন্ন ধরন ও তাদের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রায়ই 'নির্বাচনি গণতন্ত্র' (Electoral Democracy) হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এই বর্ণনা ১৯৯১ পরবর্তী সকল নির্বাচিত সরকারের শাসনের ক্ষেত্রেই খাটে। ১৯৯১ পরবর্তীকালে প্রায় নিয়মিতভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই সময়ের শাসনব্যবস্থা ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়কালের কর্তৃত্ববাদী সেনাশাসন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর হাতে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ও তা নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। তাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একাধারে তিন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি প্রধানমন্ত্রী, সংসদীয় দলের প্রধান এবং তাঁর দলের প্রধান।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

❑ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উদ্ভব

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের উপস্থিতি অনেক আগে থেকেই ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত বাংলায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। তবে পরবর্তী সময়ে নানা সীমাবদ্ধতা এবং ১৯৩৯-৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে এ ব্যবস্থা ভেঙে যায়। পরবর্তী সময়ে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী শাসকগণ জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে গণতন্ত্রের অপমান করেন। তবে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে সচেতন জনগণ বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালনা করে। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

❑ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উপস্থিতি থাকলেও সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা অনেক বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষকের মতে লক্ষ্য করা যায় না। গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে বাংলাদেশের মানুষ যে সংগ্রাম শুরু করেছিল তা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পূর্ণতা পায়নি। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো গণতন্ত্রের জোয়ারে উদ্ভাসিত হলেও বাংলাদেশের বাস্তবতা তেমন নয়। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা লক্ষণীয়ভাবে বিকশিত না হওয়ার পিছনে নানা কারণ দায়ী। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে- সহনশীলতার অভাব, পরমতসহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অনুপস্থিতি, ক্ষমতালিপ্সা, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ইত্যাদি। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বয়স অর্ধশতক অতিক্রম করলেও এর সাফল্যের দৃষ্টান্ত এত বেশি নয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য সকলের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তার বিপরীত চিত্রই দেখা যায়। এরূপ অরাজকতাপূর্ণ অবস্থার জন্য ক্ষমতালিপ্সু ও স্বার্থপর গোষ্ঠীই দায়ী। প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনেক মহৎ হলেও তা পুরোপুরি পূর্ণতা পায়নি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে। রাজনৈতিক মতবিরোধ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বারবার। তাই সব মিলিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা যতটুকু আমাদের প্রত্যাশিত ঠিক সে পর্যায়ের নেই বললেই চলে।

রাজনৈতিক দল

❑ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি

~~কবিতাবলী~~ ✡

✓ ~~অতঃপর ধুলো:~~

✓ ~~ক্ষোভ: সময় ব্যাকরণ~~

✱ প্রণয় স্মৃতি

✱ নিশীথে দেবী

✓ সান্নিধ্য প্রার্থী

✓ সংলাপ: দুপুর সন্ধ্যে

✓ কিছু ইচ্ছে সময় আলো

রাজনৈতিক দল

❑ একদলীয় শাসন ব্যবস্থা

যখন রাষ্ট্রে একটিমাত্র দল থাকে তখন তাকে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বলা হয়। একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একটিমাত্র দল থাকে। এ ধরনের ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকে। কোন দলের উদ্ভব হলে তা উৎপাটন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ইতালীর ফ্যাসিষ্ট এবং জার্মানীর নাৎসী দল এই ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদলীয় ব্যবস্থায় দলীয় প্রধান সাধারণত সরকার প্রধান হন।

একদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা মূলত উপদলীয় (Factional) । দলের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় দলের নেতৃবৃন্দ পরস্পর বিরোধী। এ ধরণের পরিবেশে ব্যক্তিত্ব ধর্ম (Personality Cult) এর উদ্ভব ঘটে। যেমন: সাম্প্রতিক ইতিহাসে চীনের মাও সেতুং, সোভিয়েত রাশিয়ার যোসেফ স্ট্যালিন প্রমুখ।

রাজনৈতিক দল

❑ দুই দলীয় শাসন ব্যবস্থা

দেশে মাত্র দু'টি দল থাকলে তাকে দ্বিদলীয় শাসন ব্যবস্থা বলে। একটি দল সরকার গঠন করে এবং অন্যদল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দ্বিদলীয় শাসন ব্যবস্থা দেখা যায় না। এমনকি বৃটেনে শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দল প্রধান দল হলেও সেখানে উদারনৈতিক দল ও সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্ভব ঘটেছে। তবে প্রকৃতিগতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বৃটেনে দ্বিদল ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। কারণ অন্যান্য দলের সমর্থক সংখ্যা অতি নগণ্য।

দুই দলীয় ব্যবস্থায় অন্তঃদলীয় ও আন্তঃদলীয় উভয় অঙ্গনেই প্রতিযোগিতা থাকে। নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বীয় দলের শিখরে আরোহনের চেষ্টা করে। অন্যদিকে, এই প্রচেষ্টায় অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে তাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় যা ব্যক্তিস্বার্থকেও আহত করে। স্পষ্ট দুই দলীয় ব্যবস্থার চর্চা রাজনৈতিক নেতৃত্বনিষ্ঠার জন্য আদর্শ। কিন্তু, এ ধরণের ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পার্থক্য অনেক কম থাকে। অধিকাংশ বিষয়েই দল দুইটি পরস্পর বিপরীত অবস্থান নেয়। প্রতিটি সিদ্ধান্তে উভয় পক্ষই অনেক শক্তিশালী হওয়ায় সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়। এছাড়া দুই দলীয় শাসন ব্যবস্থা রাজনৈতিক মেরুকরণের (Polarization) আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক দল

❑ বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন দুটির বেশি দল, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে 'বহুদলীয় ব্যবস্থা' বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত সাধারণ নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। ফলে নির্বাচনে জয় লাভের জন্য অনেক সময় সমমনা দলগুলির সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সরকার' গঠিত হয়। ফ্রান্স, ইতালি, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে এরূপ বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।

বহুদলীয় ব্যবস্থায় অনেক দল মত আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। পরোক্ষ গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়ন বহুদলীয় পদ্ধতিতে হওয়ার কথা। কিন্তু, মানুষের মনস্তত্ত্ব ও প্রবণতার সীমাবদ্ধতা প্রকৃত বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রধান বাধা। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে মতামত বহুবিভক্ত না হয়ে বরং দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক বাস্তবতায় জোট ও কোয়ালিশনের মাধ্যমে বহুদলীয় ব্যবস্থা কার্যত একটি দুই দলীয় শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

রাজনৈতিক দলের আদর্শ

❑ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ

নোবেলজয়ী জার্মান ঔপন্যাসিক Thomas Mann এর বিখ্যাত উক্তি, "Everything is Politics". রাজনীতি থেকে সমাজকে আলাদা করা কিছুতেই সম্ভব না। রাজনীতির মাধ্যমেই সমাজ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই কারণে রাজনৈতিক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং মূল্যবোধের প্রতীক। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দলের দৃষ্টিভঙ্গীও ঐ মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। দলের অন্যতম লক্ষ্য হল, নিজস্ব রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিকোণের দ্বারা নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ঐ মূল্যবোধ ও দৃষ্টিকোণ সঞ্চারিত করা। রাজনৈতিক দল এমন একটি সামাজিক কাঠামো যার পক্ষে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে বিপুল সংখ্যক মানুষকে জড়িত করা সম্ভব। তার মাধ্যমে একদিকে সংযোগ সাধন এবং অন্যদিকে অংশগ্রহণের মাত্রার প্রসার ঘটে। রাজনৈতিক কার্যাবলীতে উদ্বুদ্ধ করে রাজনৈতিক দল বিদ্যমান রাজনৈতিক মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস দৃঢ় করতে অথবা নতুন মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সঞ্চারে সাহায্য করে। সুতরাং রাজনৈতিক দল দু'ভাবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে সাহায্য করে-

- বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তিকে দৃঢ় করে তার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখে;
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিদ্যমান কাঠামোর পরিবর্তন করে।

ফ্যাসিবাদের মত সামগ্রিকতাবাদী ব্যবস্থায়, স্বৈরতন্ত্র এবং আধুনিক বহু উদারপন্থী রাষ্ট্রেও জরুরি অবস্থায় কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা এবং জনসংযোগ সাধনের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মূল্যবোধ সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দল কেবল একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাহনই নয়, ঐ সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক সংযোগ সাধনের মাধ্যমরূপেও ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন ব্যবস্থানুকূল রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল সেই দায়িত্ব পালন করে।

রাজনৈতিক দলের আদর্শ

❑ আদর্শিক দিকস্থিতি: ডান ও বামপন্থা

আঠারো শতকের শেষের দিকে ফরাসি বিপ্লবের সময় রাজনীতিতে বামপন্থি ও ডানপন্থি ধারণার সূচনা হয়। তৎকালীন ফ্রান্সের সংসদে শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত প্রথাগত রাজতন্ত্র ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসীরা স্পিকারের ডানদিকে এবং তাদের বিরোধী সাম্যবাদী, অসাম্প্রদায়িক বিপ্লবী চিন্তাধারার সদস্যরা স্পিকারের বামদিকে বসতো। ফ্রান্সের অনুসরণে ইউরোপের অন্যান্য আইনসভাতেও সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা আলাদা বসতে শুরু করে সে সময়ে। উনিশ শতকে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে ফরাসি বিপ্লবের সময়ের ন্যায় উগ্রবাদী রক্ষণশীল রাজতন্ত্রীদের ডানপন্থি এবং সাম্যবাদী, উদারবাদীদের বামপন্থি বলা হত। পরবর্তীতে ফ্রান্স থেকে ইউরোপ হয়ে অন্যান্য মহাদেশেও ডানপন্থি ও বামপন্থি ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে যে কোনো মূল্যে প্রথাগত শাসনব্যবস্থা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের বামপন্থি হিসেব চিহ্নিত করে।

রাজনীতিতে বামপন্থি ও ডানপন্থি চিন্তাধারার মধ্যবর্তী কিছু নেই। অর্থাৎ কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী ডানপন্থি না হলে সে অবশ্যই বামপন্থি। এই দুই পন্থিদের রাজনীতিতে কিছু উপবিভাগ রয়েছে; যেমন অতি ডানপন্থি, চরম ডানপন্থি প্রভৃতি। যদিও ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে পুরাতন মতাদর্শে বিশ্বাসী কট্টরপন্থিরা ডানপন্থি হিসেবে পরিচিতি লাভের পাশাপাশি বামপন্থিদের কাছে জনসমর্থন হারাতে শুরু করে। ধনবাদী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উদারবাদী বামপন্থিরা ক্ষমতায় আসতে শরু করে। তবে বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে আবারো অতি ডানপন্থি দলগুলো পুনরায় জনসমর্থন লাভ করছে।

রাজনৈতিক দলের আদর্শ

❑ রাজনৈতিক মেরুকরণ

আদর্শের প্রশ্নে জনমতের দ্বিধাবিভক্তিকে রাজনৈতিক মেরুকরণ বলে। রাজনৈতিক মেরুকরণের কারণ অনুসন্ধানে ব্যক্তিমানুষের দুইটি প্রবণতা বিবেচনায় রাখা দরকার-

প্রথমত, মনস্তাত্ত্বিক কারণে মানুষের চিন্তা ও মূল্যায়ন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্যনীয়।

দ্বিতীয়ত, ভাব বিনিময়ের স্বার্থে ব্যক্তিমানুষ সম্ভাব্য সকল বিষয়েই কিছু একটা মতামত ধারণ করতে চায়।

এই দুইটি প্রবণতার মিথস্ক্রিয়াকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যায়। একজন মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য সব রাজনৈতিক প্রশ্নে সুচিন্তিত ও জ্ঞাননির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না। যেসব প্রশ্নে মানুষটির জ্ঞান নেই অথবা আগ্রহ নেই- সেসব প্রসঙ্গে মতামত তৈরি করার জন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বড় ভূমিকা থাকে। মিটিং, মিছিল, সমাবেশ থেকে শুরু করে গণমাধ্যম পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলো তাদের আদর্শ, অবস্থান ও পরিকল্পনার প্রচারণা চালাতে থাকে। এই প্রচারণার প্রভাবে ব্যক্তিমানুষ তার জ্ঞানের ওপর নয় বরং প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে পাওয়া অন্য অজস্র মানুষের মতামতে প্রভাবিত হয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এডওয়ার্ড হারমান ও নোয়াম চমস্কি তাদের “Manufacturing Consent” বইয়ে এই প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন কেমন করে রাজনৈতিক স্বার্থে গণমাধ্যম ব্যবহার করে ন্যায় ও অন্যায়ের সংজ্ঞা পালটে দেওয়া যায়। গণমাধ্যমের প্রমত্ত তৎপরতায় মানুষ তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিপরিচয়ের সাথে সংলগ্ন করে ফেলে। নাম, পরিবার, জাতীয়তার পরই রাজনৈতিক দল ও পথকে মানুষ তার আত্মপরিচয় হিসেবে ধারণ করে। সমর্থিত দলের পক্ষে অন্যায়কেও তার চোখে সঠিক মনে হয়। এভাবে দলভক্তি অনেকটাই ধর্মীয় মূল্যবোধের কাছাকাছি মর্মার্থ বহন করে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সবার জন্য শ্রেয়তর সমাজ নির্মাণের বিপরীতে দলভক্ত বিরোধের মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াটিই রাজনৈতিক মেরুকরণ এর সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা।

রাজনৈতিক দলের আদর্শ

❑ রাজনৈতিক উপদলীয়করণ

রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির মধ্যে থেকেই একটি আদর্শিক অবস্থান নির্মাণ করে। অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলের বিস্তৃত আদর্শ দলটির সদস্যদের ব্যক্তিগত আদর্শ ও স্বার্থ সংরক্ষণে যথেষ্ট হয় না। ধর্ম, বর্ণ, অর্থনৈতিক ও পেশাগত স্বার্থে রাজনৈতিক দলের অন্তর্গত বিভাজন হতে থাকে। এইভাবে উপদলগুলো ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দলটির মৌলিক আদর্শকে গ্রাস করে নেয়।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপদলীয়করণ খুবই নিয়মিত ঘটনা। প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের অজস্র উপদল যারা দলের অভ্যন্তরে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠির মতো ভুমিকা পালন করে। বিভিন্ন পেশাভিত্তিক উপদলের পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপদলীয়করণের অংশ। যতো বেশি উপদল গড়ে, মৌলিক আদর্শেরও ততোই বিচ্যুতি ঘটে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপদলীয়করণ রোধ করার প্রচেষ্টা রাজনৈতিক সদিচ্ছার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ

❑ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

✓ গঠন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর প্রতিষ্ঠা ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায়। প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। প্রতিষ্ঠাকালে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৫৩ সালে বঙ্গবন্ধু প্রথমবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়। ১৯৬৪ সালে মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগিশকে সভাপতি এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচত করা হয়। ১ মার্চ ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে সামরিক ক্যু দাতাদের হাতে নিহত হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বর্তমানে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ এর নির্বাচিত সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ

✓ মূলনীতি ও ভূমিকা

আওয়ামী লীগ এর মূলনীতি হচ্ছে- বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ, উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দলীয় গঠনতন্ত্রে সকলের জন্য সাম্য এই অর্থে সমাজতান্ত্রিক নীতি গৃহীত হয়। বিশ্বের পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তে মুক্ত বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দলটি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ পূর্ব বাংলার জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সচেষ্ট ছিল। পাকিস্তান শাসন আমলে ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম গড়ে তুলে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে দলটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান প্রণয়ন করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। সংসদীয় গণতন্ত্র, মুক্ত বাজার অর্থনীতির আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি আওয়ামী লীগের বর্তমান কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ

✓ নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতা লাভ

প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর পর সভাপতি হন মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি নির্বাচিত হবার পর ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। দলটির সাধারণ সম্পাদকের পদে তাজউদ্দিন আহমেদ, জিল্লুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ জনপ্রিয় নেতারা ছিলেন। বর্তমান সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন ওবায়দুল কাদের।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দুইবারই আওয়ামী লীগ বিপুল জনসমর্থন লাভ করে বিজয় অর্জন করে। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ মোট ৫ বার বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে প্রথমবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় শাসনের দায়িত্ব পায় আওয়ামী লীগ। এরপর ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৮ সাল থেকে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ

❑ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)

✓ **প্রতিষ্ঠা:** জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের ৩০ নভেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আবির্ভূত হন। জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার অঙ্গীকার করলেও পরবর্তীতে তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠান ও রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই তিনি ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বি.এন.পি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

✓ **মূলনীতি ও ভূমিকা**

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) আওয়ামী লীগ বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জেনারেল জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচিকে দলের কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বি.এন.পি জাতীয় ঐক্য, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। বি.এন.পি বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে 'গ্রাম সরকার ব্যবস্থা' পুনরায় প্রবর্তন করা, স্বনির্ভরতা, দুর্নীতি দূরীকরণসহ বাংলাদেশের উন্নয়নের অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশের আধুনিক ও প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে এটি একটি অন্যতম দল। জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি.এন.পি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে বেগম জিয়ার আপোষহীন ভূমিকার কারণে বি.এন.পি'র জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ

✓ নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতা লাভ

প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমৃত্যু বি.এন.পি'র প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান বি.এন.পি. এর নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হলে প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বি.এন.পি'র হাল ধরেন। পরবর্তীতে বেগম খালেদা জিয়া পার্টির নেতৃত্বে আসেন। বর্তমানে তিনিই দলের চেয়ারপার্সন।

জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন অবসানের পর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয় লাভ করে বি.এন.পি ১৯৯১ সালে সরকার গঠন করেছিল। ১৯৯৬ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তাদের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত গণতন্ত্রকে অনেকটা হুমকির সম্মুখে ঠেলে একদলীয় নির্বাচন করে ২য় বারের মতো সরকার গঠন করে। এই সরকারের মেয়াদ ছিল মাত্র ৪৫ দিন। একই বছর ১২ জুন, ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে বি.এন.পি'র পরাজয় ঘটে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুনরায় বি.এন.পি জয় লাভ করে সরকার গঠন করলেও দুর্নীতি ও ক্ষমতার ব্যাপক অপব্যবহারের কারণে ব্যাপক সমালোচিত হয় যার ফলে ২০০৮ সালের নির্বাচনে দলের ব্যাপক ভরাডুবি ঘটে বলে অনেকে মনে করেন। ২০১৪ সালে নির্বাচন বর্জন করে দলটি বর্তমানে রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। আবার, ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও মাত্র ছয়টি আসনে জয় লাভ করে।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ

❑ জাতীয় পার্টি

জেনারেল জিয়াউর রহমানের দল গঠন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে জেনারেল এইচ. এম.এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি গঠন করেন। এরশাদ তাঁর অবৈধ সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণ ও বৈধকরণের জন্য ১৯৮৩ সালে জনদল ও ১৯৮৫ সালে জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করে। তবে তা স্থায়ী হয়নি। জাতীয় পার্টি বর্তমানে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল।

✓ মূলনীতি ও কর্মসূচি

জাতীয় পার্টি গঠনতন্ত্রে ৫টি মৌলিক আদর্শের উল্লেখ করেছে। যথা-স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ইসলামী আদর্শ ও সকল ধর্মের স্বাধীনতা, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতি এবং অর্থনৈতিক মুক্তি। জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে জেনারেল জিয়ার অনুকরণে নতুন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গিকার করে ১৮ দফা কর্মসূচি পেশ করেন। পরবর্তীতে এর উপর ভিত্তি করে জাতীয় পার্টির ১২ দফা কর্মসূচি গৃহীত হয়।

জাতীয় পার্টি নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশে পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বললেও বর্তমানে সে অবস্থান থেকে সরে এসেছে বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এমন লোকজন জাতীয় পার্টির মূল সমর্থক। জেনারেল এরশাদের মৃত্যুর পরে জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে মতোবিরোধ সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ

✓ রাজনীতিতে ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে জাতীয় পার্টির উল্লেখযোগ্য কোনো ইতিবাচক ভূমিকা নেই। বারবার নীতি ও কৌশলগত রাজনৈতিক দিক পরিবর্তনের কারণে জাতীয় পার্টিকে রাজনৈতিক অঙ্গনে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান জোটবদ্ধ রাজনীতিতে জাতীয় পার্টির গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ

❑ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

মওলানা মওদুদীর নেতৃত্বে ১৯৪১ সালে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' নামে বর্তমান 'জামায়াতে ইসলামী'র কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলে দলটিও দু'ভাগে বিভক্ত হয়। পাকিস্তানে এর নাম হয় 'জামায়াত-ই-ইসলামী পাকিস্তান'। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দলটি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সাধারণ নিরীহ মানুষদের হত্যা ও লুটতরাজে অংশগ্রহণ করাসহ বুদ্ধিজীবী হত্যার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। দলের অন্যতম নেতা অধ্যাপক গোলাম আজম বিদেশে আশ্রয় নেন। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলে জারিকৃত রাজনৈতিক দলবিধি ১৯৭৬ এর আওতায় প্রথমে জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ (১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত) এর মধ্য থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। পরবর্তীতে 'জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ' নামে ১৯৭৯ সালের মে মাসে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ

✓ বাংলাদেশে ক্ষমতা লাভ

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীসহ সকল ধর্মভিত্তিক সংগঠনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলে এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার মধ্য দিয়ে দলটিকে পুনরায় রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে সহায়তা করা হয়। পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী জামায়াত নেতা গোলাম আজম দেশে ফিরে আসেন। ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে জামায়াতে ইসলামী জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য তৎপর হয়ে উঠে। ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে বি.এন.পি'র সাথে জোটবদ্ধ হয়ে জামায়াতে ইসলামী সরকার বিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়। ২০০১ সালে বি.এন.পি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের শরিক হয়ে দলটি সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে।

✓ দলের নিবন্ধন বাতিল

২০১৩ সালের ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয় হাইকোর্ট। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে দলটি। অবশেষে, আপিল নিষ্পত্তির পরে ২০১৮ সালের ৮ ডিসেম্বর দলটির নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন। দলটির নিবন্ধন নম্বর ছিল ১৪।

সরকার ও বিরোধী দল সম্পর্ক

❑ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা

দল প্রথার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সে দলই শাসনকার্য পরিচালনা করে। নিবার্চনে পরাজিত দল বা দলগুলি আইন সভাতে বিরোধী দলের ভূমিকা নেয়। একটি আদর্শ বিরোধী দল কেবল বিরোধীতার খাতিরেই বিরোধীতা করে না। বরং সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা, ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়া এবং জাতীয়স্বার্থে প্রয়োজন মাফিক সরকারকে পরামর্শ দেয়ার দায়িত্ব পালন করে। নিম্নে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা আলোচনা করা হল:

- **গঠনমূলক সমালোচনা:** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দল সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকারকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। সরকার বিরোধী দলের সমালোচনার চাপে একক কোনো সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। বিরোধী দল সুপরিকল্পিতভাবে সরকারের সমালোচনা করে সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে।

- **অধিকার বাস্তবায়ন:** জনগণের অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিরোধী দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার যাতে জনগণের অধিকার খর্ব করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পারে সে ব্যাপারে বিরোধী দলকে সচেষ্ট থাকতে হয়।

সরকার ও বিরোধী দল সম্পর্ক

- **গণতন্ত্র রক্ষা:** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না। গণতন্ত্র মানেই বিভিন্ন মতামতের সংমিশ্রণ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের সহাবস্থান অবশ্যই থাকতে হয়। শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাবে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে যেতে পারে। জন স্টুয়ার্ট মিল তাই বলেন, "যেখানে বিরোধী দল নেই, সেখানে গণতন্ত্র নেই"।

- **বিকল্প নীতি উত্থাপন:** বিরোধী দলের অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে সরকারি নীতিমালাগুলো ভালোভাবে যাচাই বাছাই করা। এক্ষেত্রে যদি কোনো নীতিমালা জনবান্ধব মনে না হয়, সেক্ষেত্রে বিরোধী দল দেশের স্বার্থে উন্নততর বিকল্প নীতি প্রস্তাব করতে পারে। এর মধ্য দিয়ে বিরোধী দল জনগণের নিকট তাদের অবস্থানও স্পষ্ট করতে পারে।

- **সমস্যা চিহ্নিত করা:** রাষ্ট্রে অনেক ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের সমস্যাগুলো সমগ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে বিরোধীদল সরকারের কাছে উপস্থাপন করতে পারে।

- **জনমত গঠন:** রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে কোনো দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারলে, সেগুলো ব্যবহার করে বিরোধী দল নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করতে পারে। বিরোধী দল যদি তাদের যুক্তির স্বপক্ষে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে পারে তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে তাদের ক্ষমতায় আসার পথ সুগম হয়।

সরকার ও বিরোধী দল সম্পর্ক

- **প্রার্থী মনোনয়ন:** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে থাকে। আর এ ক্ষমতা হস্তান্তরের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হল সাধারণ নির্বাচন। তাই নির্বাচনের সময় বিরোধী দল নিজ আদর্শ সংশ্লিষ্ট প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারকার্য চালায়।

- **পারস্পরিক সম্পর্ক:** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য বিরোধী দলকে ভূমিকা রাখতে হয়। এক্ষেত্রে সরকারি দলের সাথে সার্বক্ষনিক বৈরিতার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার পরিবর্তে যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা ও প্রয়োজন মাফিক সমর্থন দান করাটাও বিরোধী দলের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

- **রাজনৈতিক সংযোগ সাধন:** আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অন্যতম কাজ হল রাজনৈতিক সংযোগ সাধন। বিরোধী দল জনগনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বা মতামতকে সরকারের নিকট পেশ করে থাকে। এভাবে বিরোধী দলের সাথে জনগণের সংযোগ সাধন হয়ে থাকে।

সরকার ও বিরোধী দল সম্পর্ক

- **রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ:** রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিরোধী দল তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জনগণকে রাজনীতির সাথে একত্রীকরণ, ভোট সম্পর্কে সচেতন করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধী দল কাজ করে থাকে। আর এভাবেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সৃষ্টি হয়।

- **জবাবদিহি নিশ্চিত করা:** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভা তাদের কার্যের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। মন্ত্রিসভার যেকোনো সিদ্ধান্ত বা নীতি সম্পর্কে বিরোধীদলের সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। মন্ত্রীগণ তার জবাব দিতে বাধ্য থাকেন। যে কোনো আপত্তিকর সিদ্ধান্ত বা নীতির বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় সদস্যরা অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য বিরোধী দল অতি আবশ্যক। কোনো রাষ্ট্রে যদি শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকে, তাহলে সে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে পরিণত হবার আশঙ্কা থাকে। সরকারকে সর্বদা বিরোধী দলের দাবির প্রতি সহনশীল হতে হবে। আবার বিরোধী দল অহেতুক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি না করার ব্যাপারে সর্তক থাকবে। বস্তুতঃ বিরোধী দল ছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থাই অচল হয়ে পড়ে। এসব কারণে, সার্বিক গুরুত্ব বিবেচনা করে, ব্রিটেনে বিরোধী দলকে মহামান্য রাজা রাণীর বিরোধী দল বলা হয়ে থাকে।

বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- (ক) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব কী? [৪৩তম বিসিএস]
- (খ) বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
- (গ) বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বাবলি বর্ণনা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
- জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (আরপিও) বলতে কী বোঝেন? [৪১তম বিসিএস]
- জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা কী ভূমিকা পালন করতে পারে? [৪১তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে জোট গঠন নতুন কোনো ঘটনা নয়–আলোচনা করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে কোন ধরনের দল ব্যবস্থা রয়েছে? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। [৩৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি সংক্ষেপে লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]
- ১৯৯১ সাল পরবর্তী বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় রাজনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী। [৩৫তম বিসিএস]
- গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নয়নের রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা কী হওয়া উচিৎ? গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চায় সিভিল-সেনাবাহিনী সম্পর্ক কতটা প্রয়োজনীয়? আলোচনা করুন। [৩১তম বিসিএস]
- দেশের অর্থনীতির সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক আছে কি? হ্যাঁ/না হলে তা যুক্তিসহ আলোচনা কর। [২৮তম বিসিএস]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

#

[illegible] [illegible] [illegible] 2025. [illegible]

কোচিং

নিজস্ব এলাকা সেবা, কাজ + ধুম

প্রমাণ

ক্ষতি: মজা বিধি যোগ

নিরাপদ ভেঙে যায়

মানুষ ধূসর

সবুজ ভয়

ভোজন ধন

সরকার: দলঃ চট্টগ্রাম মন্ত্রী মানুষ

দিন

১৯৫৪ : যুক্তফ্রন্ট

AL

BNP

AL

৭ দল

৫ দল

২০০১ : ৪ দল

BNP

AL

২০০৮ : ১৪ দল

২০১৪ : ২০ দল

BNP

১৪ দল

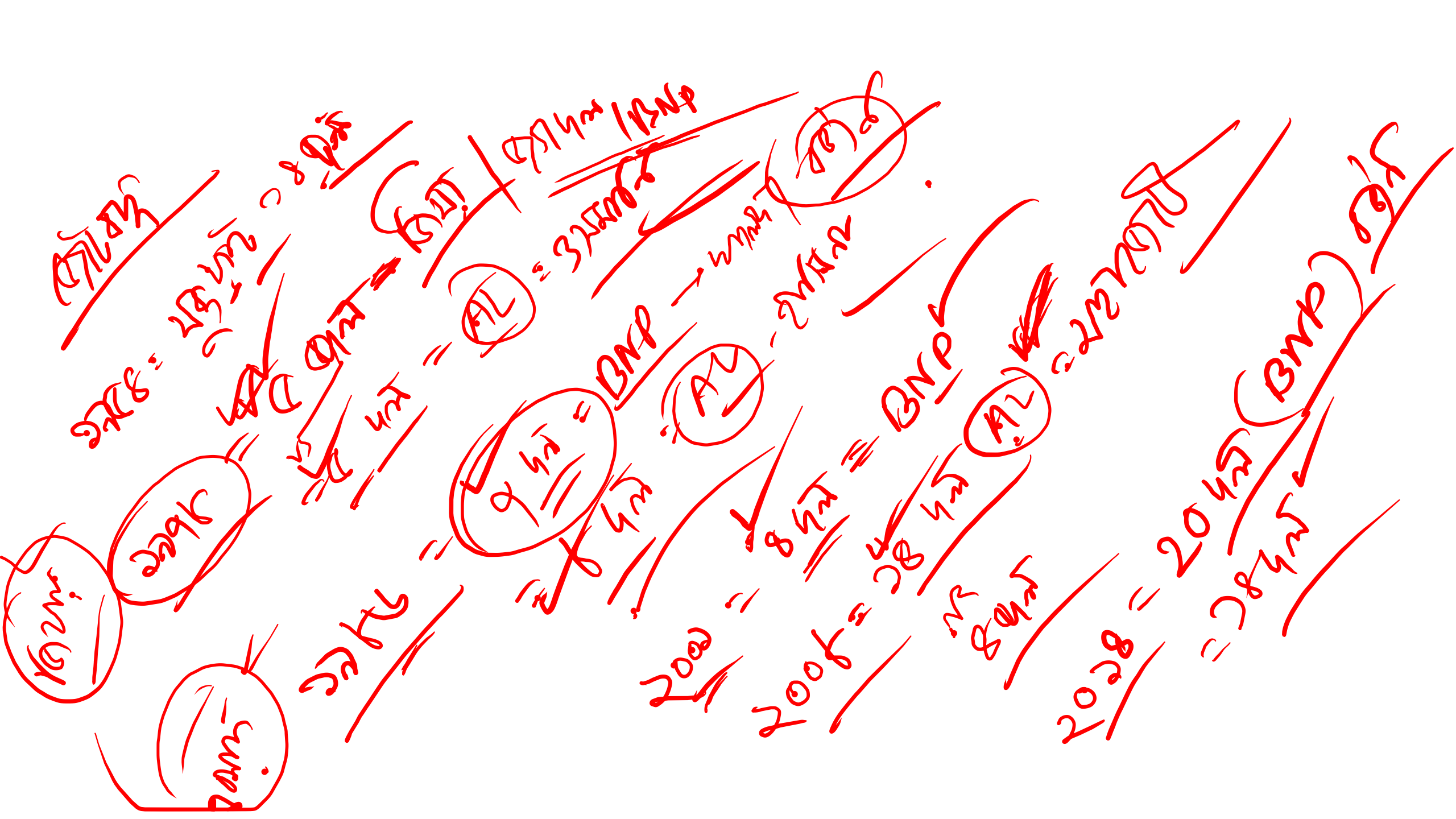

বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- গণতন্ত্র কী? বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু কার্যকারিতার অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করুন। [২৭তম বিসিএস]
- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ কী কী? আলোচনা করুন। [২৭তম বিসিএস]
- "গণতন্ত্রের সফলতার জন্য ক্ষমতাসীন দলের সহনশীলতা এবং বিরোধী দলের দায়িত্বশীল ব্যবহার, উভয়ই সমান প্রয়োজন"। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন। [২৪তম বিসিএস]
- সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা বর্ণনা করুন। [২৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রবণতা কতদূর? [২৩তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। [১৫তম বিসিএস]

টীকাসমূহ:

- গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা। [৪১তম বিসিএস]
- ১০ নভেম্বর, ১৯৮৭ [১৫তম বিসিএস]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়